সমকাল

2 2 DEC 2025

বিসিআইর এজিএম

# শিল্প এলাকায় গ্যাস ও বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিতের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সব শিল্প এলাকায় গ্যাস এবং বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। উৎপাদনের কার্যকর সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য এবং উৎপাদনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মসৃণ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাসহ আরও কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। বিসিআইর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যা জানানো হয়।

গত শনিবার অনুষ্ঠিত এজিএমে সভাপতিত্ব করেন বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)। সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল ড. মো. হেলাল উদ্দিন। সভাপতি বলেন, বিসিআই দেশের সব ধরনের শিল্পের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে শিল্পের সমস্যা সমাধানে সরকারের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করছে।

তিনি তাঁর বক্তব্যে গ্যাস-বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং গণতান্ত্রিক মসৃণ উত্তরণের পাশাপাশি আরও কিছু সুপারিশ করেন। এর মধ্য রয়েছে– আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং আয় বৈষম্য কমাতে টেকসই এমএসএমই উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া; শিল্প খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষাবিদ, শিল্প এবং সরকারের যৌথ সহযোগিতা; টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন উদ্যোক্তাবান্ধব করা; নতুন উদ্যোক্তা ইত্যাদি।

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

প্রথম আলো 22 DEC 2025

# রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়




আয়োজনে

প্রথম আলো

সহযোগিতায়

PRAN | RFL

## সুপারিশ

- রপ্তানি খাতের জন্য বন্ড ও লাইসেন্স-প্রক্রিয়া সহজ করে সময় ও খরচ কমানো।
- স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত কাস্টমস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- ছোট ও মাঝারি ব্যবসাকে সহায়তা করে এক্সপোর্ট হাউস ও ট্রেডিং কোম্পানি তৈরি করা।
- কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- রপ্তানি খাতে নতুন পণ্য ও খাত চিহ্নিত করে বৈচিত্র্যকরণ।
- সরকারি নীতিমালা ও প্রক্রিয়াকে সহজ, দীর্ঘমেয়াদি ও সময়োপযোগী করা।

**শেখ বশিরউদ্দীন**
মাননীয় উপদেষ্টা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়



মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করার কথা প্রায়ই বলা হয়। সবাই বলে, এফটিএ জাদুর কাঠি। বাস্তবে এফটিএ কোনো জাদুর কাঠির সমাধান নয় বা মহৌষধ নয়। চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য আমদানিনির্ভর। [illegible]

[illegible]

**মো. মাহবুবুর রহমান**
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এইচএসবিসি বাংলাদেশ



পোশাকের বাইরে কোন কোন পণ্যের রপ্তানি বিলিয়ন ডলারে নিতে পারি, তা ঠিক করতে হবে। ২০ বছর আগে আমাদের রপ্তানি ৯ বিলিয়ন ডলার ছিল, এখন তা ৫০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। [illegible]

[illegible] স্কেল তৈরি করেছে এবং বহুজাতিক বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়েছে।

আমরা মধ্যপ্রাচ্য ও আসিয়ানের দেশগুলোয় রপ্তানির দিকে নজর দিতে পারি। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তুলনামূলক সহজ। জাতীয় পর্যায়ে একটি উচ্চমানের বাজার ও পণ্যভিত্তিক গবেষণা দরকার, যেখানে নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্য চিহ্নিত করে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য নীতিগত, অবকাঠামোগত ও দক্ষতা উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করা হবে। তাহলেই পোশাকের বাইরে রপ্তানিবৈচিত্র্য বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

**আহসান খান চৌধুরী**
চেয়ারম্যান ও সিইও, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ



রপ্তানি বাড়ানো ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। [illegible]

[illegible] সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানে যেতে হবে।

ট্যারিফ ব্যবস্থাও বড় চ্যালেঞ্জ। ভারত আসিয়ান অঞ্চলে শূন্য শুল্ক-সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু আমরা তা পাচ্ছি না। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অভাব আমাদের রপ্তানি সম্প্রসারণকে সীমিত করছে। রপ্তানি বাড়াতে হলে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য বাছাই করে সেগুলোর জন্য টার্গেটেড ট্যারিফ ও বাণিজ্য কৌশল নিতে হবে।

**সৈয়দ এস কায়সার কবির**
সহসভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি এবং
এমডি, রেনাটা পিএলসি



দেশের উদ্যোক্তাদের ক্রিমিনাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেটি বাদ দিতে হবে। উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। পণ্য রপ্তানি করে বাড়তি ডলার পেতে হলে ডলারকে বাইরে যেতে দিতে হবে। অর্থাৎ বিদেশে বিনিয়োগ সহজ করতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, বিনিয়োগ করবেন না; ওষুধের দাম কমান।

ওষুধের দাম কম বললে মন্ত্রণালয় বলে, দাম আরও কমান; আপনারা চুষে খাচ্ছেন। অথচ সময়ের ব্যবধানে ওষুধে নিট মুনাফা ১৫ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে ওষুধের দাম সবচেয়ে কম বাংলাদেশে। দয়া করে আমাদের রক্তচোষা বলবেন না। উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি দিন। ওষুধশিল্পের বৈচিত্র্যকরণ করা উচিত। কারণ, ওষুধে মূল্য সংযোজন অনেক বেশি।

ফার্মাসিউটিক্যাল খাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। এই মুহূর্তে ডলারের পরিমাণ বা রপ্তানিতে গার্মেন্টসের শতাংশ কত—সেটাই মুখ্য নয়। গার্মেন্টস রপ্তানির বড় অংশ দখল করে আছে, এটা নিয়ে হাহাকার না করে আমাদের শিল্প বৈচিত্র্যকরণে মনোযোগ দেওয়া দরকার। বিশেষ করে যেখানে উচ্চ মূল্য সংযোজন সম্ভব এবং দেশেই মেধা ধরে রাখা যায়।

যদি ওষুধ রপ্তানির জন্য আমাদের কোম্পানিগুলো মার্কিন বাজারের জন্য সব অনুমোদন করে, তাহলে বাংলাদেশের পণ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। তখন পণ্যের মান নিয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না। সে জন্য ওষুধশিল্পের উন্নয়নে জোর দিন।

রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণে আরেকটি বড় বিষয় হলো, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিয়োগ নীতি। ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে লাইসেন্সিং, বিদেশে বিনিয়োগ বা প্রযুক্তি কেনার ক্ষেত্রে ডলার বাইরে পাঠাতে হয়। কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ নীতির জটিলতায় বারবার অনুমতির মুখোমুখি হতে হয়। অথচ ডলার আনার জন্যই অনেক সময় ডলার বাইরে যেতে দিতে হয়—এই বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতে হবে।

এ ছাড়া পণ্য রেজিস্ট্রেশন, আন্তর্জাতিক পরিদর্শন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা বড় বাধা। লাখ লাখ ডলার খরচ করেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। ঔষধ প্রশাসনকে দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে অপরাধীকরণ করা হয়েছে, তাতে কিছু গোষ্ঠী সুবিধা পেয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্ত করতে হবে।

**মো. নাসির খান**
সহসভাপতি,
চামড়া পণ্য ও জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতি



রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণে আমরা কীভাবে বাস্তবে এগোতে পারি; অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বর্তমান কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থা রপ্তানিকারকদের জন্য সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও দুর্নীতিগ্রস্ত। এই ব্যবস্থার জটিলতা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, শুধু যারা প্রতিদিন রপ্তানি করে, তারাই জানে। বন্ড লাইসেন্স পেতে অসংখ্য দপ্তরের অনুমোদন লাগে, ইনবন্ড-আউটবন্ড প্রক্রিয়া এতটাই জটিল যে উৎপাদন ও শিপমেন্টে মারাত্মক বিলম্ব হয়। এর ফলে রপ্তানিকারকদের ডেমারেজ, দেরিতে শিপমেন্ট ও অদৃশ্য খরচ মিলিয়ে বিপুল ক্ষতি হয়, যা সরাসরি প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।

যারা শতভাগ রপ্তানি করে, তাদের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টির ভিত্তিতে সহজ ও স্বচ্ছ বন্ড সুবিধা চালু হলে আলাদা লাইসেন্সের প্রয়োজন থাকবে না। এতে দুর্নীতি কমবে, সময় বাঁচবে ও উৎপাদন ব্যয় কমবে। রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণে এটি একটি মৌলিক সংস্কার।

আমাদের মূল ফোকাস হওয়া উচিত ভ্যালু অ্যাডিশন। গার্মেন্টসের মতো অন্য খাতেও যদি কাঁচামাল আমদানি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে রপ্তানি অনুমোদন দেওয়া হয়, তাহলে জুতা, চামড়া, প্লাস্টিক, পাট, সিরামিক, ফার্নিচার, ওষুধ ও গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ—এই খাতগুলো দ্রুত বড় আকার নিতে পারে। সমস্যাটা সম্ভাবনায় নয়, সমস্যাটা অপারেশনাল জটিলতায়।

কাস্টমস ও বন্দরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও বড় চ্যালেঞ্জ। বন্দর সক্ষম হলেও কাস্টমস প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা পুরো সাপ্লাই চেইনকে আটকে দেয়। একই পণ্যের জন্য একাধিক মূল্যায়ন, দীর্ঘ ক্লিয়ারেন্স সময়—এসব রপ্তানিকে ব্যয়বহুল করে তোলে।

**রুপালী চৌধুরী**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বার্জার পেইন্টস



রপ্তানির বাড়াতে সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা, কমপ্লায়েন্স ও লজিস্টিকস সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে হলে উৎপাদন মান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ছাড়া বিকল্প নেই। একবার আমরা থাইল্যান্ডে একটি পণ্য রপ্তানির চেষ্টা করেছিলাম। পণ্যটি তারা পছন্দ করলেও ভারতের সঙ্গে তাদের এফটিএ থাকায় ৫ শতাংশ দামের তারতম্যের কারণে আমরা বাজারে টিকতে পারিনি। এরপর আমরা কৌশল বদলে আমদানিনির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করেছি। আগে যেসব পণ্য বাইরে থেকে আনতাম, যেমন ফুড গ্রেড ক্যান, সেগুলো দেশে তৈরি করেছি; কিন্তু এখানেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সার্টিফিকেশন।

বাংলাদেশে সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের নয়। ফলে পণ্য সার্টিফাই করাতে আমাদের ভারত বা সিঙ্গাপুরে যেতে হয়। এতে খরচ বাড়ে, সময় নষ্ট হয়, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হয়। কৃষিপণ্য থেকে শুরু করে শিল্পপণ্য—সব ক্ষেত্রেই প্রত্যয়ন ও পরীক্ষায় নানা অসংগতি রয়েছে। সে জন্য সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিএসটিআইসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্যাটাগরি-স্পেসিফিক আধুনিক ল্যাবে রূপান্তর করা জরুরি, যা আন্তর্জাতিক মানে স্বীকৃত হবে। এখানে সরকারকে ইনস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্টে বিনিয়োগ করতেই হবে, আর বেসরকারি খাত সেখানে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমপ্লায়েন্স। আমরা একসময় যেসব বাজারে শক্ত অবস্থানে ছিলাম, সেখান থেকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়েছি। কারণ, আমাদের পরিদর্শন, অডিট ও মাননিয়ন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল। ফলে বাজারে আস্থা নষ্ট হচ্ছে। রপ্তানি বৈচিত্র্য ধরে রাখতে হলে কমপ্লায়েন্স শক্ত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

**সামিম আহমেদ**
সভাপতি,
বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন



গার্মেন্টসের বাইরে গিয়ে আমরা রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণে কী করতে পারি। এ ক্ষেত্রে প্লাস্টিক খাত একটি বড় সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্লাস্টিক শিল্পের ভেতরে বহু উপখাত রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি সরাসরি রপ্তানিযোগ্য। এর মধ্যে খেলনা, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ, ব্যাগ ও প্যাকেজিং এবং গৃহস্থালি পণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের বড় সমস্যা হলো—বাস্তবে যে রপ্তানি হচ্ছে, তার একটি বড় অংশ পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না। প্লাস্টিক গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ, ইউনিট প্যাকেজিং বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাত পণ্যের প্যাকেজিং হিসেবে যে রপ্তানি হয়, সেগুলো মূলত প্রচ্ছন্ন রপ্তানি। নীতিমালায় এগুলোকে সরাসরি রপ্তানি হিসেবে দেখানোর কথা থাকলেও বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয় না। আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো—বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি। সঠিক তথ্য না থাকায় খাতভিত্তিক রপ্তানি মূল্যায়ন ব্যাহত হয়। অথচ প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি—উভয় ধরনের রপ্তানি একসঙ্গে বিবেচনা করলে অনেক খাতই বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। এতে বিনিয়োগ, নীতি সহায়তা ও আন্তর্জাতিক বাজারে দর-কষাকষি সহজ হতো।

প্লাস্টিক শিল্প এখন একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় কাঁচামাল উৎপাদন বাড়ছে, রিসাইক্লিং সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, ফলে আমদানিনির্ভরতা কমছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য, বিশেষ করে আধুনিক খেলনা, ইলেকট্রনিক ও মেকানিক্যাল কম্পোনেন্টযুক্ত পণ্যে মূল্য সংযোজন বাড়ছে। এ জায়গাটিতে আমাদের আরও বিনিয়োগ ও নীতিগত স্বীকৃতি দরকার। প্লাস্টিকের পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াজাত পণ্য, নন-লেদার জুতা, হস্তশিল্প, হালকা প্রকৌশল ও আসবাব খাতেও রপ্তানির বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

**মো. শাহজাহান চৌধুরী**
সভাপতি,
বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন



একসময় প্রক্রিয়াজাত ও হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত ছিল। কিন্তু নীতিগত দুর্বলতা, কাঁচামালের সংকট ও বাস্তবসম্মত সহায়তার অভাবে আজ এই খাত অনেক নিচে নেমে গেছে। স্বাধীনতার পর যে খাতটি ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠেছিল, সেটি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারেনি। আমরা যারা এখন এই ব্যবসায় আছি, তারা মূলত দ্বিতীয় প্রজন্ম। দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি দেখেছি, সমস্যাগুলো নতুন নয়, দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাঠামোগত সংকটই আমাদের পিছিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ববাজারে চিংড়ি ও হিমায়িত মাছের বিশাল চাহিদা রয়েছে। বাগদা চিংড়ি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পণ্য হলেও পর্যাপ্ত কাঁচামাল, আধুনিক চাষব্যবস্থা ও নীতিগত সহায়তার অভাবে আমরা সেই বাজারে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারিনি। ফলে সম্ভাবনার তুলনায় আমাদের অংশ খুবই সীমিত। বাস্তবতা হলো, খাতটির মূল শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা তা কাজে লাগাতে পারছি না।

বর্তমানে কিছু কারখানা বিশ্বমানের রপ্তানি করছে, কিন্তু অধিকাংশ কারখানা টিকে থাকার লড়াইয়ে আছে। একসময় যেসব কারখানা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছিল, তার বড় অংশই এখন বন্ধ বা প্রায় অচল। এতে শুধু রপ্তানি নয়, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ—সবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমাদের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চ সুদের হার। কৃষিপণ্য হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি থাকলেও আমরা কৃষি খাতের মতো সুবিধা পাই না। এত বেশি সুদে ঋণ নিয়ে কোনো দেশেই টেকসই রপ্তানি সম্ভব নয়। নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে আমার স্পষ্ট দাবি—এই খাতকে কৃষিভিত্তিক রপ্তানি হিসেবে বিবেচনা করে অর্থায়ন ও ভর্তুকির কাঠামো সহজ করতে হবে।

**সায়েমা হক বিদিশা**
অধ্যাপক,
অর্থনীতি বিভাগ ও প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



সার্বিক সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শ্রমিকের দক্ষতা এবং গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ। এই জায়গায় বিনিয়োগ বাড়লে শ্রমিক, মালিক—সব পক্ষই উপকৃত হবে। এর সঙ্গে যুক্ত আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে খাদ্যভিত্তিক এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা প্রায়ই বলেন, তাঁরা নিজের মতো করে কাজ করছেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাচ্ছেন না। যেহেতু এই খাতগুলো শ্রমঘন, তাই এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দরকার, যা আমরা এখনো পর্যাপ্তভাবে দিতে পারছি না।

প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রমিকের দক্ষতা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে, সেটিও বড় প্রশ্ন। আপস্কিলিং, রিস্কিলিং এবং প্রযুক্তিগত অভিযোজন—এই তিন জায়গায় আমাদের ঘাটতি স্পষ্ট। এর পাশাপাশি দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা রয়েছে, যেগুলো এক দিনে দূর করা সম্ভব নয়। তবে কাঁচামালের অপ্রতুলতা, উচ্চ ফ্রেট চার্জের মতো নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো কিছু খাতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে অ্যাগ্রো প্রসেসিং, কৃষি ও পাট খাতে।

ফ্রোজেন ফুড খাতের ক্ষেত্রেও আমরা একসময় যে সম্ভাবনার কথা বলতাম, সেখান থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছি। কিছু উচ্চফলনশীল জাতের অভাবে আমাদের উৎপাদনশীলতা কম, ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছি। একইভাবে চামড়া খাতে পরিবেশগত মান, সিইটিপির সীমাবদ্ধতা ও সার্টিফিকেশন-সংক্রান্ত জটিলতা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। এখানে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে না পারায় আমরা একটি বড় সুযোগ হারাচ্ছি।

ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি। ফার্মেসি, বায়োকেমিস্ট্রি, জেনেটিকস ও মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে পড়া তরুণদের জন্য এখানে ভালো সুযোগ রয়েছে। পাট ও প্রাকৃতিক ফাইবারভিত্তিক পণ্যের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং ও মাননিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। শুধু কাঁচামাল নয়, উচ্চমূল্যের সৃজনশীল পণ্য তৈরি করে নতুন বাজার ধরার সুযোগ রয়েছে।

**নাহিয়ান রহমান**
নির্বাহী সদস্য,
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)



বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামে যে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছে, তার বেশির ভাগই রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে গেছে। ফলে দেশটির রপ্তানি খাত বড় হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের উন্নয়নেও ভিয়েতনামের এই এফডিআই মডেলের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। ভিয়েতনামে যাওয়া প্রযুক্তি কোম্পানি এনভিডিয়া, ইন্টেলসহ বড় এফডিআই প্রকল্পগুলো রপ্তানিনির্ভর। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের পণ্য ভিয়েতনামে উৎপাদিত হয়ে অন্যান্য দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিনিয়োগের পাশাপাশি দক্ষতা স্থানান্তর ও অংশীদারত্বের মাধ্যমে দেশটির শিল্প খাতে সক্ষমতা বেড়েছে। বর্তমান 'ট্যারিফ ফোবিয়ার' সময়ে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ অপরিহার্য।

রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে হলে তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য খাত থেকে অন্তত ২০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় আসতে হবে। সে লক্ষ্য অর্জনে তৈরি পোশাকের বাইরের খাতগুলোয় প্রবৃদ্ধি আড়াই গুণ বাড়াতে হবে।

একটি ছোট অর্থনীতিতে প্রাথমিকভাবে এক থেকে দুটি খাতে বেশি নজর দেওয়া স্বাভাবিক। যেমন ষাট থেকে সত্তরের দশকে কোরিয়ার তৈরি পোশাক ছিল প্রধান রপ্তানি খাত। পরে তারা অন্যান্য খাতে বিস্তার ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সঠিক খাত চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী প্রাধান্য দেওয়াই মূল চ্যালেঞ্জ।

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে বিডা নিয়মিত কাজ করছে। দেশের রপ্তানি খাতের সম্ভাবনাময় শীর্ষ খাতগুলো চিহ্নিত করতে ব্যবসায়ীদের মতামত নিয়েছে বিডা। বিনিয়োগ, দক্ষতা স্থানান্তর ও রপ্তানি সম্ভাবনার আলোকে আটটি খাত নিয়ে একটি হিট ম্যাপও তৈরি করা হয়েছে।

বিডায় আটটি খাতের জন্য আলাদা ডেস্ক আছে। ব্যবসায়ীরা এসব খাতের বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয় তথ্য বিডা থেকে জানতে পারবেন। সরকারও এসব খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিনির্ধারণ করতে পারে।

**মোহাম্মদ হাসান আরিফ**
ভাইস চেয়ারম্যান,
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)



বিদেশে বিভিন্ন বাংলাদেশি দূতাবাসে থাকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কমার্শিয়াল উইংগুলোকে একীভূত করে একটি স্বতন্ত্র ট্রেড প্রমোশন এজেন্সি বা বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা গঠন করতে হবে। আমাদের দেশের বাইরে বিভিন্ন দূতাবাসে কমার্শিয়াল উইং আছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় এই কমার্শিয়াল উইংগুলো কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে, তা নিয়ে এক সাবেক কমার্শিয়াল কাউন্সেলর হিসেবে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। এ কারণে অন্যান্য দেশের মতো করে এসব কমার্শিয়াল উইংসহ ইপিবিকে একটি আলাদা ট্রেড প্রমোশন এজেন্সি করা সময়ের দাবি হয়ে গেছে। একজন কমার্শিয়াল কাউন্সেলর চার বছর কাজ করে কাজ শেখেন। এরপর দেশে ফিরে উপসচিব হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ আমাদের কমার্শিয়াল উইংগুলোয় কোনো রকম কার্যকর উন্নয়ন হচ্ছে না। ফলাফলও তাই খুবই দুর্বল। নতুন সংস্থা গঠিত হলে সেটি ইপিবি ও কমার্শিয়াল উইংগুলোকে সমন্বয় করে এবং বিদেশে অবস্থান করে শুধু বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রমোশনের কাজ করবে।

বেসরকারি খাতকে কীভাবে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যায়, সেটিও গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে। নতুন বাজার খুঁজে বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য বৈচিত্র্যকরণের পাশাপাশি নতুন বাজার শনাক্ত করা ও পণ্যের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে রপ্তানি বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজার অনুসন্ধানে সরকার, ইপিবি ও উদ্যোক্তাদের যৌথভাবে এগোতে হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সফর করতে হবে। যে অঞ্চলগুলোয় এখনো আমরা খুব বেশি প্রবেশ করতে পারিনি, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আসিয়ান বা দক্ষিণ আমেরিকার মতো দেশগুলোয় নজর দেওয়া প্রয়োজন।

একজন ভোক্তা হিসেবে আমি চাইব, দেশে ভালো মানের পণ্য কম দামে পাওয়া যাক। এ জন্য অর্থনীতিতে বিদ্যমান অ্যান্টি-এক্সপোর্ট বায়াস (রপ্তানিবিরোধী মনোভাব) দূর করা জরুরি।

## অংশগ্রহণকারী

**শেখ বশিরউদ্দীন**
মাননীয় উপদেষ্টা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

**রুপালী চৌধুরী**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বার্জার পেইন্টস

**সৈয়দ এস কায়সার কবির**
সহসভাপতি, বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি এবং
এমডি, রেনাটা পিএলসি

**আহসান খান চৌধুরী**
চেয়ারম্যান ও সিইও, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

**মোহাম্মদ হাসান আরিফ**
ভাইস চেয়ারম্যান,
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

**নাহিয়ান রহমান**
নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

**সায়েমা হক বিদিশা**
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ও সহ-উপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**মো. মাহবুবুর রহমান**
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
এইচএসবিসি বাংলাদেশ

**সামিম আহমেদ**
সভাপতি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন

**মো. শাহজাহান চৌধুরী**
সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

**মো. নাসির খান**
সহ-সভাপতি, চামড়া পণ্য ও জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতি

**সঞ্চালনা**
**শওকত হোসেন**
হেড অব অনলাইন, প্রথম আলো

বণিক বার্তা
22 DEC 2025

বণিক বার্তা সোমবার, ডিসেম্বর ২২, ২০২৫ ■ পৌষ ৭, ১৪৩২

### বিএসবিআরএর তথ্য

# এক দশকে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি কমেছে ৭৮%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চলতি বছর দেশের ব্যবসায়ীরা মোট ৭ লাখ ৫৫ হাজার টন পুরনো বা স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি করেছেন, যা এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালে রেকর্ড ৩৪ লাখ ৫ হাজার ৬৮ টন আমদানি হয়েছিল। এ হিসেবে দশ বছরের ব্যবধানে আমদানি কমেছে প্রায় সাড়ে ২৬ লাখ টন বা ৭৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

হংকং কনভেনশন অনুয়ায়ী, শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডগুলো গ্রিন ইয়ার্ডে রূপান্তর না করলে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি করতে পারবে না। আর এ আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বড় ধরনের সংকটে পড়েছে দেশের জাহাজ ভাঙা শিল্প খাত। এরই মধ্যে ইয়ার্ড আধুনিকায়ন করতে না পেরে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন অনেকে। অন্যদিকে ইয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে শ্রমিকদের বড় একটি অংশ।

বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসবিআরএ) সর্বশেষ ১০ বছরের তথ্যমতে, ২০১৬ সালে ২৫২টি স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি করা হয়। যার সম্মিলিত ওজন ছিল ৩৪ লাখ ৫ হাজার ৬৮ টন। ২০১৭ সালে আনা হয় ২০৪টি জাহাজ, সম্মিলিত ওজন ছিল ২১ লাখ ২৮ হাজার ৭৬৩ টন।

২০১৮ সালে ২৫ লাখ ৪০ হাজার ১৭৮ টন বা ২১৫টি জাহাজ, ২০১৯ সালে ২৩ লাখ ৬০ হাজার ৭১৪ টন বা ২০৬টি জাহাজ, ২০২০ সালে ২০ লাখ ৩৯ হাজার ৬৬৬ টন বা ১২৮টি জাহাজ, ২০২১ সালে ২৭ লাখ ২৮ হাজার ৫৯৭ টন বা ২৮০টি জাহাজ, ২০২২ সালে ১১ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৪ টন বা ১৫০টি জাহাজ, ২০২৩ সালে ১০ লাখ ২২ হাজার ১১০ টন বা ১৭৩টি জাহাজ এবং ২০২৪ সালে ৯ লাখ ৬৮ হাজার ২২ টন বা ১৪৪টি জাহাজ আমদানি করা হয়।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত এক দশকের মধ্যে চলতি বছর স্ক্র্যাপ জাহাজের আমদানি ছিল সর্বনিম্ন, যা ১০০-এর নিচে। মূলত কভিড-১৯ মহামারীর পর থেকেই এ খাত ক্রমেই তলানির দিকে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে আমদানি হয়েছিল ৫৫টি জাহাজ, যার মোট ওজন ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৯৩৩ টন। অন্যদিকে হংকং কনভেনশন অনুযায়ী, গ্রিন ইয়ার্ড চালুর পর চলতি বছরের শেষ ছয় মাসে আমদানি হয়েছে মাত্র ৩৮টি জাহাজ, যার সম্মিলিত ওজন ৩ লাখ ২৫ হাজার ৩৯ টন। অর্থাৎ গ্রিন ইয়ার্ড বাধ্যতামূলক হওয়ার পর জাহাজ আমদানি আশঙ্কাজনক হারে কমেছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, কভিড সংক্রমণের কারণে বিশ্ববাজারে মন্দা দেখা দেয়ায় জাহাজ ভাঙা শিল্পের পতন শুরু হয়। পাশাপাশি দেশে বড় অংকের এলসি বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অভ্যন্তরীণ ডলার সংকট আমদানিতে বড় ধাক্কা দেয়। ব্যাংক ঋণ ও সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় জাহাজ আমদানি কমতে শুরু করলে অনেক ব্যবসায়ী ইয়ার্ড বন্ধ করে দেন। ২০২০ সালের পর থেকে অনেকে ইয়ার্ড বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও এখন হংকং কনভেনশন কার্যকর হওয়ায় কেবল গ্রিন ইয়ার্ডের মালিকরাই আমদানি করতে পারছেন, ফলে স্ক্র্যাপ জাহাজের সংকট আরো বেড়েছে।

বিএসবিআরএ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ১৭টি ইয়ার্ড গ্রিন ইয়ার্ডে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করেছে। আরো ছয়টি তালিকাভুক্তির শেষ ধাপে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রিন ইয়ার্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে পিএইচপি শিপ ব্রেকিং, এসএস করপোরেশন ইউনিট ১, ২ ও ৩, কবির স্টিল, কে আর শিপ রিসাইক্লিং, আরব শিপ ব্রেকিং, ম্যাক করপোরেশন, জনতা স্টিল, তাহের অ্যান্ড কোং, এনবি স্টিল অন্যতম। এছাড়া নতুন যুক্ত হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কিং স্টিল, মাদার স্টিল, মাস্টার অক্সিজেন, বারাকা শিপ রিসাইক্লিং, সাগরিকা শিপব্রেকিং ও বব শিপ রিসাইক্লিং।

বিএসবিআরএর সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী, ১১৬টি শিপইয়ার্ডের তালিকা থাকলেও প্রাথমিক অনুমোদন রয়েছে ১০৫টির। এর মধ্যে ২৩টি ইয়ার্ড গ্রিন ইয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হলেও বাজেট সংকটে অধিকাংশই আধুনিকায়নের কাজ শুরু করতে পারেনি। এক যুগ আগে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বরাদ্দকৃত নয়টি মৌজায় ১৮৫টি শিপ ইয়ার্ড নিবন্ধিত ছিল।

> চলতি বছর স্ক্র্যাপ জাহাজের আমদানি ছিল সর্বনিম্ন, যা ১০০-এর নিচে। মূলত কভিড-১৯ মহামারীর পর থেকেই এ খাত ক্রমেই তলানির দিকে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে আমদানি হয়েছিল ৫৫টি জাহাজ, যার মোট ওজন ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৯৩৩ টন। অন্যদিকে হংকং কনভেনশন অনুযায়ী, গ্রিন ইয়ার্ড চালুর পর চলতি বছরের শেষ ছয় মাসে আমদানি হয়েছে মাত্র ৩৮টি জাহাজ, যার সম্মিলিত ওজন ৩ লাখ ২৫ হাজার ৩৯ টন। অর্থাৎ গ্রিন ইয়ার্ড বাধ্যতামূলক হওয়ার পর জাহাজ আমদানি আশঙ্কাজনক হারে কমেছে

বিএসবিআরএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ ২০২২ সালে হংকং কনভেনশনে স্বাক্ষর করে, যা গত ২৫ জুন থেকে কার্যকর হয়েছে। এ কনভেনশনের শর্ত পূরণ না করলে ব্যবসায়ীরা কোনো জাহাজ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডে আনতে পারবেন না। ফলে গ্রিন শিপ ইয়ার্ড ছাড়া এ শিল্পে ব্যবসা পরিচালনার আর কোনো সুযোগ নেই, যা এ খাতের জন্য সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতা। যেখানে আগে জাহাজ এনে ইয়ার্ড চালানো যেত, এখন ইয়ার্ড প্রস্তুত না থাকলে জাহাজই আসবে না।

তিনি আরো বলেন, 'একটি ইয়ার্ডকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে (গ্রিন ইয়ার্ড) ৫০-১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা উদ্যোক্তাদের জন্য বড় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে। কারণ ব্যাংকগুলো জাহাজ আমদানিতে ঋণ দেয় কিন্তু ইয়ার্ড আধুনিকায়নে আগ্রহী নয়। যেটা প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোর সঙ্গে সংঘাত তৈরি করেছে।'

বিএসবিআরএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, 'সংকট মোকাবেলায় ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি বিশেষ ঋণের উদ্যোগ নেয়া খুবই জরুরি। গভর্নরের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তিনি আগামী বছরের শুরুতে আলোচনায় বসে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন চৌধুরী জানান, বর্তমানে দেশে ২৩টি গ্রিন শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড রয়েছে। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহযোগিতা দিলে সেটা ৬০-৭০টিতে উন্নীত করা সম্ভব। হংকং কনভেনশন অনুযায়ী ইয়ার্ড প্রস্তুত হলে পরিবেশগত ছাড়পত্রও একই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে পরিবেশ সুরক্ষা আরো শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি চট্টগ্রামে শিপ রিসাইক্লিং বোর্ডের নতুন কার্যালয় চালু হওয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা আরো বাড়বে।

The Financial Express
~~The Daily Star~~

22 DEC 2025

# Automation drives productivity in cutting, knitting: Study

MONIRA MUNNI

Automation and technological upgradation have boosted productivity at the cutting and knitting levels of garment production, while high efficiency has been found in jackets in the product category, says a study.

The Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) study conducted on six processes - knitting, weaving, wet processing, cutting, sewing, and end finishing - of eight types of products explored whether technological convergence was taking place across firms and tasks.

It found automation-intensive areas drove the strongest performance, with cutting achieving an annual productivity increase of 11.13 per cent, knitting 9.85 per cent, and wet processing 6.11 per cent.

In contrast, sewing, which remained the least automated and most labour-dependent component of the production chain, posted the lowest growth of 3.57 per cent.

Weaving and end finishing gained moderate growth of 4.43 per cent and 4.78 per cent, respectively.

The study findings, published on December 7, also said the industry maintained a compound annual productivity growth rate of 4.19 per cent during the last 10 years since 2014.

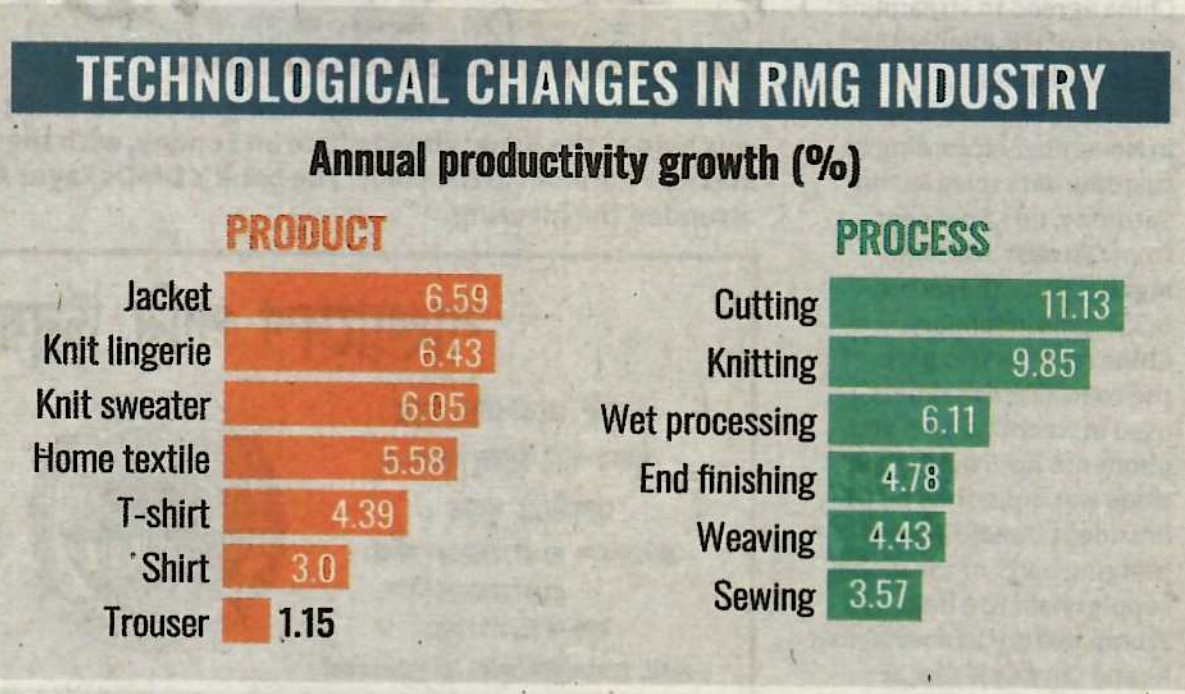




Productivity was defined as output per unit of time at the task level.

The study titled "Technological Changes at the Process and Sub-Process Level in the RMG Industry in Bangladesh" analysed technological changes at the task level of 51 apparel firms covering eight products, 39 processes, and 140 sub-processes.

The products included knit-lingerie, denim trouser, sweater, T-shirt, jacket, woven trouser, woven shirt, and home textile.

Talking about the findings, BIDS Research Associate Kazi Zubair Hossain said while the early 2000s marked the start of the RMG industry's modernisation, the following two decades were defined by automation and commitment to sustainability, such as energy and water-saving technology.

He said they documented the changes in machines and technologies over time for each process of a product and the results indicated that the industry experienced around 4.19 per cent annual growth in productivity over the last 10 years.

According to the data, jackets and knit lingerie emerged as the top-performing categories with 6.59 per cent and 6.43 per cent average annual productivity growth, respectively, while traditional woven items like trousers and shirts showed significantly slower growth of 1.15 per cent and 3.0 per cent growth, respectively.

Other products showing strong productivity growth included knit sweaters (6.05 per cent), home textiles (5.58 per cent), and T-shirts (4.39 per cent).

The BIDS researcher said a convergence of technology was occurring between large and medium-scale firms.

Technologies previously exclusive to large companies, including automated cutting, semi-automatic sewing heads, laser/ozone finishing, auto-dosing in dyeing, and digital QC tools, were becoming widespread in medium-scale factories, he said.

Inamul Haq Khan, vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), told The Financial Express fabric was one of the major parts, which constituted about 60 to 70 per cent of a clothing item, and savings in this segment meant a lot of benefits.

To gain efficiency, apparel makers had invested millions in installing automatic cutting and fabric spreading machines that could be operated by apps, he said.

He, however, said big factories had the capability to go for full or semi-automation at several process levels as they had support from either banks or their buyers.

"But small and medium-sized units that need technological upgradation the most hardly get banking or other support in this regard," he noted.

He said balancing, modernisation, rehabilitation, and expansion (BMRE) had also taken place in sewing and other process segments, resulting in enhanced productivity, efficiency, and reduced manpower.

Industry insiders said significant capacity expansion in garment factories had taken place over the past decade through a rise in technical professionals like graduates and diploma textile and industrial engineers, increased use of software, direct exports, and certifications.

Investment in research and development had also increased in some products like home textiles and sweaters, they added.

*Munni_fe@yahoo.com*

The Daily Star

22 DEC 2025

# China's rare-earth magnet exports hit 2nd-highest ever in Nov

China's exports of rare-earth magnets rose to the second-highest level on record in November, the first full month after the US and China agreed to streamline exports of the elements, reports Reuters.

Exports hit 6,150 metric tons in November, according to customs data released on Saturday, up 12 per cent from October and the highest since the record 6,357 tons in January.

China restricted exports of the specialised magnets used in weapons, cars and phones in April during the trade war unleashed by US President Donald Trump, bringing parts of the global supply chain to a halt.

Trump said on October 30 that he and Chinese leader Xi Jinping had agreed at a summit in South Korea to keep rare earths exports flowing in a deal in which he trimmed tariffs on Chinese goods.

China's export volumes have steadily recovered after a series of diplomatic deals culminating in the Trump-Xi summit, which included a special category meant to speed up shipments.

China's rare-earth magnet exports to the US totalled 582 metric tons in November, down 11 per cent from the month before but within the average range since July.

Exports to Japan, embroiled in a diplomatic spat with Beijing, grew 35 per cent to 305 metric tons, the highest this year.